আত্মশক্তির জাগরণে ধর্মীয় ভিত্তির বিপত্তি

আবদুর রাউফ

১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল আল্লাম ইকবালের কাব্যগ্রন্থ ‘আসরার - এ খুদি’ বা আত্মবোধের গুঢ় কথা। ১৯২২ সালে বেরিয়েছিল কাজী নজল ইসলামের ‘বিদ্রোহী’। ‘আসরার - এ - খুদি’ - তে ইকবাল যে আত্ম বাআমিত্বের জাগরণ কামনা করেছিলেন পাঁচ বছর পরে ‘বিদ্রোহী’- তে দেখা যায় তার বিস্ফোরণ। ইকবালের আত্মার খবর ততদিনে নজল পেয়েছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। কিন্তু একই দেশে একই কালে বিরাজমান দুই মহাকবির ভাবজগতের এক আশর্চ্য সাদৃশ্য লক্ষ্য না করে উপায় নেই। ইকবাল কথিত আত্ম স্বরূপ উদ্‌ঘাটন প্রসঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদ ‘আসরার - এ - খুদি’ -র কয়েকটি লাইনের ভাষান্তর ঘটিয়ে লিখেছিলেন

‘আমিত্বের স্বরূপ হচ্ছে নিজেকে প্রকাশ করা,
প্রতি কণায় ঘুমিয়ে আমিত্বের বীর্য।
জীবন লুকিয়ে আছে অন্বেষণে,
এর মূল নিহিত রয়েছে চাই - মন্ত্রের উপায়
জ্ঞানের কাজ আমিত্বকে শক্তিমান করা।
আমি - রূপ যে আলো - কণিকা
তা এই মাটির তলায় লুকানো স্ফুলিঙ্গ
প্রেমের দ্বারা বর্ধিত হয় এর বায়ু
আরো তাজা হয়, আলো জ্বলে, আরো ঝলমল করে।’
এই ‘তাজা’, ‘প্রজ্বলিত’ এবং ‘ঝলমল’ করা ‘আমি’ - কে আমরা পাই নজলের ‘বিদ্রোহী’ - তে।
‘বল বীর ----
বল উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি নত - শির ওই শিখর হিমাদ্রির -’

হিমাদ্রিসদৃশ এই উদ্ধত আমিত্বের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন যে কবি তাঁকে স্বাগত জানাতে রবীন্দ্রনাথের বিলম্ব হয়নি। কারণ তাঁরও রচনার একটা বড় অংশ জুড়ে আছে এই আত্মশক্তি উদ্‌বোধনেরই ভাবনা। শঙ্খ ঘোষের ব্যাখ্যায় ‘রবীন্দ্রনাথ সে - আত্মশক্তির কথা তাঁর প্রবন্ধগুলিতে বলেছিলেন এক ভাষায়, ‘নৈবেদ্য’ থেকে ‘গীতাঞ্জলি’ পর্যন্ত কবিতাগুলিতে অন্য ভাষায়, কিন্তু প্রায় একই তার অন্তঃসূত্র। অনেক সময় আমরা ধরে নিই যে শতাব্দীর কবিতাগুলিতে অন্য ভাষায়, কিন্তু প্রায় একই তার অন্তঃসূত্র। অনেক সময় আমরা ধরে নিই যে শতাব্দীর প্রথম ওই দশকটা জুড়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতাচর্চায় যেন সমকালের সমাজ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন এক অধ্যাত্মসাধনার পর্বই শুধু আছে। কিন্তু এই পটভূমিতে দেখলে তাকে আর তত বিচ্ছিন্ন এক পর্ব বলে মনে করবার বিশেষ কারণ থাকে না। ‘নৈবেদ্য’র কবিতাগুলির একটা বড় অংশেই যে প্রার্থনা,

সে তো কেবল 'দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর/ বেদনায়'/নিজেকে দায়বদ্ধ করে নেবার প্রার্থনা। 'এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে/ সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার/ মনুষ্যমর্যাদাগর্ব চিরপরিহার-/ এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ - আঘাতে / চূর্ণ করি দূর করো' -- এই হলো সেখানে প্রার্থনা।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে নজলের 'বিদ্রোহী' - তে যে আত্মশক্তি বা আমিত্বের জাগরণ ভারতের সাহিত্য সাধনায় তার একটাপটভূমি রচিত হয়েছিল বিংশ শতকের প্রারম্ভেই। রচয়িতা ছিলেন অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ এবং ইকবাল। সাধনাটাখুবই জরি ছিল। কারণ প্রাচ্যের এই মহান দেশের সুসমৃদ্ধ সভ্যতার উত্তরাধিকারীরা কালক্রমে হয়ে পড়েছিল আত্মপ্রত্যয়হীন। তাদের অধ্যাত্মসাধনা পর্যবসিত হয়েছিল আত্ম বিলুপ্তির সাধনায়। সংসার - সমরাঙ্গনের যাবতীয় চ্যালেঞ্জেরসামনে তাদের স্বভাব হয়ে পড়েছিল আত্মসমর্পণকারী। ফলে অনিবার্যভাবে দীনতা, হীনতা এবং সর্বোপরি পরাধীনতার গ্লানিময় জীবন বরণ করে নেওয়া ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর ছিল না। এরকম পরিস্থিতিতে ব্যক্তিমানুষের পক্ষেআত্ম প্রত্যয় ফিরে পাওয়াটাই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে কঠিন সাধনার ব্যাপার। যে মানুষের আত্মপ্রত্যয় থাকেনা তারপক্ষে উন্নতি, বিকাশ কিংবা সমৃদ্ধির সাধনা সম্ভব নয়। যে জাগতিক সমৃদ্ধি চায় না তার মনে প্রকৃতিকে বশ করে উন্নতির অনুকূল করে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অন্বেষা কিংবা বিজ্ঞান চিন্তার বিকাশ ঘটে না। যাদের অনুসন্ধিৎসা থাকে না, বিজ্ঞান চিন্তা থাকে না, তারা যে যাবতীয় সামাজিক - রাষ্ট্রিক জবরদস্তির সামনে মাথা নত করে থাকবে, ধর্মীয় বিকৃতি, অন্ধত্ব এবং কুসংস্কারের বন্ধনকে বিনা প্রশ্নে মেনে চলবে--- এটাই স্বাভাবিক। বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথ এবংইকবাল যখন আত্মশক্তির উদ্‌বোধনের কথা বলেন, তখন আমাদের দেশের পরিস্থিতিটা ছিল এইরকমই।

কিন্তু এই মহাকবিদ্বয়ের কেউই পাশ্চাত্য প্রদর্শিত নাস্তিক্যের পথে আত্মশক্তির উদ্‌বোধনের পন্থায় আস্থা স্থাপন করতে পারেননি। প্রাচ্যের মহান ধর্মীয় ঐতিহ্যের নতুনতর ব্যাখ্যার মধ্যেই তারা পথ খুঁজেছেন। ফলে তাঁদের সাধনার মর্মবস্তু বিশেষ করে অনুসন্ধিৎসু প্রাচ্যদেশীয় তণেরা হৃদয়ঙ্গম করেছিল অতি দ্রুত। তণদের মধ্যে এই অনুসন্ধিৎসা জেগে ওঠার মূলে ছিল আধুনিক শিক্ষার প্রভাব, পাশ্চাত্যের সঙ্গে তুলনায় নিজেদের হীনাবস্থা অনুধাবনের সুযোগ এবং পাশ্চাত্য প্রভুদের কাছ থেকে পাওয়া লাঞ্ছনার মর্মজ্বালা ফলে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েই ছিল। এই ক্ষেত্রকে আরও উর্বর করে তুলেছিল উদারনৈতিক ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদীদের শিক্ষা। এই শিক্ষাই প্রাচ্যদেশীয় তণদের নাস্তিক্যপন্থী হয়ে ওঠার পথে সৃষ্টি করছিল সবচেয়ে বড় বাধা। তাই আত্মশক্তির উদ্‌বোধনে আস্তিক্যপন্থী সাধনাই তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল অত দ্রুত। বিংশ শতকের প্রারম্ভিক পর্বেই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ, কবিতা,নাটক, গল্প - উপন্যাস ইত্যাদি সৃজনসম্ভার তাঁর অনুরাগী পাঠকদের মনে আত্ম - জাগরণের যাবতীয় আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেলেছিল। নজলের 'বিদ্রোহী' -র বিস্ফোরণ তাই আকস্মিক কোনও ঘটনা নয়। অপর দিকে ইকবালের'আসরার - এ খুদি' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ করে উর্দুভাষী তণদের মধ্যে জাগরণের বন্যা বয়ে যায়। তারা বলতে শু করে 'ঢশুস্ত্রস্তু ড্ড্রব্দ স্তুপ্সপ্পন্দ্বত্রপ্পস্ফুন্ধব্দদ্ধ ব্ত্বব্দত্রব্দত্র ত্তন্দ্ববব্দন্দ্রড়ত্রুস্তু ড্ড্রস্তু ব্দদ্ধনজ্জজন্দ্বস্তু ব্ধড়ন্দ্ব স্তুন্দ্ধ্রস্তু ভ্রনব্ধড় প্তুনন্দ্রন্দ্ব' এভাবে মৃতের মধ্যে প্রাণসঞ্চারের মূলে ছিল ইকবালের খুদি তত্ত্ব বা আত্ম - তত্ত্বের অমোঘ বাণীর স্পর্শ।

কিন্তু 'খুদি' আত্মশক্তির জাগরণ যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের জন্ম দেয় তা সব সময় কল্যাণমুখী হবে - এমন কোন কথা নেই। তার মধ্যে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠার প্রবণতাটাই থাকে বেশি পরিমাণে। নজলের 'বিদ্রোহী' - তেও রয়েছে সেই সুর

'আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল।
আমি মানি না কো' কোনো আইন....

....

আমি কভু প্রশান্ত, -কভু অশান্ত দাণ স্বেচ্ছাচারী
আমি অণ খুনের তণ আমি বিধির দর্প - হারী।'

নজল অবশ্য আত্মশক্তির জাগরণের ফলে এই 'উচ্ছৃঙ্খল' এবং 'স্বেচ্ছাচারী' 'অণ খুনের তণ' - দের অভীষ্ট যে শেষ পর্যন্ত মানবকল্যাণমুখী সেকথাই ঘোষণা করেছেন

'মহা বিদ্রোহী রণ - ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত

যাবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন - রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপান ভীম রণভূমে রণিবে না।'
কিন্তু আত্মশক্তির উদ্‌বোধনের ফলে যারা বিদ্রোহী এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তাদের সবাই অভীষ্ট হিসাবে অত্যাচারীর বিদ্ধে সংগ্রামকে বেছে নেবে এরকম কোনও কথা নেই। তাই 'খুদি' -র উদ্‌বোধনে যারা উদ্বুদ্ধ ইকবাল চেয়েছেন তারা হয়ে উঠুক মর্দ - এ - মোমিন বা মর্দ - এ - কামিল।
কেমন করে হয়ে ওঠা সম্ভব এই মর্দ - এ - কামিল সেটি বর্ণনা করা হয়েছে 'আসরার -এ - খুদি'-র নবম সর্গে। শঙ্খ ঘোষ অতি প্রাঞ্জল ভাবে বর্ণনা করেছেন এই প্রক্রিয়াটি। '....তিনটে স্তরের মধ্যে দিয়ে এগোতে হবে তাকে। প্রথম, নিয়মের অনুবর্তিতা; দ্বিতীয়, আত্মশাসন; আর তৃতীয়, ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব। 'আসরার - এ - খুদি' -র সতেরো বছর পরে, জাভেদনামার মধ্যে এই তিন স্তরের কথা বলা হয়েছে একটু ভিন্ন ভাষায়, আর সেইটাকেই হয়তো বলা যায় তাঁর স্বচ্ছতর এবং পরিণততর কল্পনার প্রকাশ। ঊর্ধ্বচারণের পথপ্রদর্শক জালালুদ্দিন মিকে যখন জিজ্ঞেস করলেন কবি 'কাকে বলি আছে? কী - বা নেই? ভালো বলি মন্দ বলি, তার ঠিক মানে আছে কোনো?' মি তখন বললেন---
'আছে তা-ই আবির্ভূত হতে যে চেয়েছে
সত্তার আবেগ শুধু অবিরাম আত্মপ্রকাশন
জীবন মানেই হলো আত্মবোধে নিজেকে সাজানো
নিজের সত্তার কাছে সত্য হতে চাওয়াই জীবন।
প্রথম আদির দিনে মিলেছিল সমস্ত যেখানে।
নিজেরাই সত্তার কাছে সত্য হতে চেয়েছিল তারা।
মৃত না জীবিত তুমি? নাকি জীবন্মৃত হয়ে আছো?
সেকথা জানার জন্য তিন -সাক্ষ্য তোমার সাহারা।
প্রথম সাক্ষ্যটি হলো আত্মসচেতন হয়ে ওঠা
নিজের আলোয় তুলে দেখে নেওয়া যথার্থ নিজেকে
এবং দ্বিতীয় সাক্ষ্য আমি ছাড়া অন্যের চেতনা
যেখানে নিজেকে দেখি অন্যের আলোর পাশে রেখে।
তৃতীয় সাক্ষ্যের নাম নিভৃত চেতনা ঈশ্বরের,
ঈশ্বরের আলো দিয়ে নিজেকে যেখানে দেখা যায়
সে- আলোর সামনে এসে যদি তুমি স্থির হতে পারে
তবে জেনো, আছ তুমি, বেঁচে আছো ঈশ্বরের প্রায়।
জীবন মানেই হলো সেই পরিণাম ছুঁতে চাওয়া
জীবন মানেই হলো নিরাবৃত পরমকে পাওয়া'
নিজের সামনে, অন্যের সামনে আর ঈশ্বরের সামনে নিজেকে প্রকাশ করা, নিজেকে প্রতিপন্ন করা - এরই মধ্যে আছে ইকবালের আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা। এরই বিকাশের মধ্য দিয়ে কেবলই এগিয়ে চলতে পারে মানুষ, তার সেই চলার বা বিকাশের শেষ নেই। না, শেষ আছে, বিকাশের চূড়ান্ত মুহূর্তে সে হয়ে উঠতে পারে প্রায় ঈশ্বরোপম, অসীম শক্তিময়, ইকবালের ভাষায়, তখন সে হয়ে ওঠে মর্দ - এ - মোমিন বা মর্দ - এ - কামিল।
রবীন্দ্রনাথ -ও আত্মশক্তির জাগরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষকে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠার প্রবণতাথেকে রক্ষা করার পন্থা নিয়ে ভেবেছিলেন। ভেবেছিলেন তাকে Perfect man বা সম্পূর্ণ মানুষ কিংবা, ইকবালের ভাষায়, মর্দ - এ - কামিল বা ইনসান - এ - কামিল করে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া নিয়ে। শঙ্খ ঘোষ বলেছেন, তাঁর এই ভাবনার '.....চরিত্ররূপটা আমরা দেখতে পাই উদয়াদিত্য বা গোবিন্দমাণিক্যে,গুগোবিন্দ বা ধনঞ্জয়ে, গোরা বা নিখিলেশ। আর এইসব চরিত্রের সামনে এসে আমরা বুঝতে পারি রবীন্দ্রনাথ কীভাবে ব্যক্তি থেকে সমাজের দিকে আমাদের টান দেন, কীভাবে ইকবালের মতোই তিনি বলতে পারেন সেখানে,ব্যক্তি তার সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য পৌঁছায় গিয়ে সঙ্ঘে। শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালার

প্রাকৃতিকতায়, সত্যকে তখনদেখি নিছক বাইরের চেহারায়। তার দ্বিতীয় অবস্থান অন্তর্জগতে 'যে বাহিরকে একদিন রাজা বলে মেনেছিলুম, তাকেকঠোর যুদ্ধে পরাস্ত করে দিয়ে ভিতরকেই জয়ী বলে প্রচার করলুম।' কিন্তু এই জয়েই আমাদের শেষ পরিণাম বলতে পারবে না। আধ্যাত্মিকতার তৃতীয় স্তর পাব তখন, যখন 'অন্তরের নিগূঢ় কেন্দ্র থেকে নিখিল বিশ্বের অভিমুখে ছড়িয়ে পড় তে পারি আমরা,' যখন বলতে পারি '.....ভেদ নয় তখন মিলন, তখন আমি নয় তখন সব।" খুদি - র জাগরণ বা আত্মশক্তি-র উদ্‌বোধনের পরিণাম যাতে স্বৈরাচার বা স্বেচ্ছাচারে পর্যবসিত না হয় সেজন্যে মানুষকে স ম্পূর্ণতা অর্জনের বা ইনসান - এ - কামিল হয়ে ওঠার যে পন্থা রবীন্দ্রনাথ এবং ইকবাল নির্দেশ করেছিলেন সেই দুইপন্থ ার মধ্যে অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। মানুষের পূর্ণতা অর্জনের সাধনাকে নাস্তিক্যনয় আ স্তিক্যের পথেই তাঁরা পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই আস্তিক্য চেতনায় কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের ভিত্তি ছিল না। যেটা ছিল ইকবালের চেতনায়। ইকবাল স্পষ্টতই আত্ম বা খুদি - কে চালিত করতে চেয়েছেন ইসলামের পথে। কাজী আবদুল ওদুদ কৃত বাংলায় খুদি-র প্রতি তাঁর আহ্বান এইরকম

'ও রে বেহুশ, অনুগত হতে শেষ
আনুগত্য থেকে জন্ম হয় কর্তৃত্বের।

যার নিজের উপরে কর্তৃত্ব নেই
তার উপরে কর্তৃত্ব করবে অন্যজন।

আল্লাহ্‌র জন্য ভিন্ন তলোয়ার খোলে
সেই তলোয়ারের খাপ হয় তার বুক।
সংসারে সর্বশক্তিমানের প্রতিনিধি হওয়া আনন্দের
প্রকৃতির উপরে স্বামিত্ব লাভ করা আনন্দের।'

বোঝা যায় ইসলাম ধর্মের মৌলিক আদর্শের প্রতি ইকবালের আস্থা ছিল সুগভীর। উদ্বুদ্ধ খুদি - কে তিনি অনুগত হতে বলেছেন ইসলামের প্রত, ইসলামে বর্ণিত আল্লার প্রতি। কারণ, তাঁর মতে সেই অনুগত্যই নিজের প্রতিকর্তৃত্ব অর্জনের একমাত্র পন্থা। কাজী আবদুল ওদুদের সংশয় এই প্রশ্নেই। ইকবালের মূল্যায়ন প্রশ্ন তিনি লিখেছেন, 'এশিয়া-আফ্রিকার সব চাইতে বড় প্রয়োজন যেটি সেটি হচ্ছে তার জড়তা - বিসর্জন আর প্রাত্যহিক জীবনকে সুন্দরতর করার আগ্রহ। এ আগ্রহ ব্যক্ত হয়েছে এ - কালে প্রাচ্যের বহু কর্মী ও ভাবুকের বাণীতে। সেই আগ্রহ ইকবালেরকাব্যে ধারণ করেছে এক প্রবল অগ্নিশিখার মতো মোহন রূপ। তাই তিনি যে এ-যুগের তণ সমাজের - আপাততমুসলিম তণের - প্রাণের মানুষ হয়েছেন, এ অনেকটা অপরিহার্য।' কিন্তু মহাকবি গ্যেটে যেমন বলেছেন, 'যে কাল যা সৃষ্টি করে তাতে মেটে সেই কালেরই প্রয়োজন' -- ফাউসট্ -এর প্রথম দৃশ্য থেকে সেই উক্তি উদ্ধৃত করে কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন, 'অতীত থেকে পাওয়া যেতে পারে কিছু প্রেরণা যদি সঙ্কল্প সাধু হয়। সেজন্য কবি ইকবালের সঙ্গে তুলনায় চিন্তানেতা ইকবাল আমার কাছে কিছুটা স্বল্পমূল্য এবং আমার এমন আশঙ্কাও আছে যে চিন্তানেতা নীটশে যেমন পরোক্ষভাবে ইওরোপের বর্তমান ধবংসলীলার কারণ হয়েছেন তেমনি ইকবালের চিন্তাধারাও এমন অপব্যাখ্যা সম্ভবপর - এমন অপব্যাখ্যা বঙ্কিমের চিন্তাধারা হয়েছে - যার ফলে তাঁর মনুষ্যত্ব ও প্রতিভা তাঁর স্বদেশীয়দের আনন্দের কারণ না হয়ে দুঃখের কারণ হতে পারে দীর্ঘদিনের জন্য।' ওদুদের আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না তাইতিমধ্যেই প্রমানিত হয়েছে একাধিকবার। দেশভাগের গভীর দুঃখের মূলে যেসব গুত্বপূর্ণ কারণের উল্লেখ করা যায় তার মধ্যে ইকবাল সৃষ্ট প্যান ইসলামবাদের আবেগ যে অন্যতম, একথা অস্বীকার করা যায় না। কয়েক মিলিয়ন মানুষের হত্যাযজ্ঞের ভিতর দিয়ে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টি আবার নতুন করে প্রমাণ করেছে ইকবালসৃষ্ট প্যানইসলামবাদের আবেগ কতখানি ব্যর্থ। তাঁর স্বপ্নভূমি অবশিষ্ট পাকিস্তানও কি এর সৃষ্টির অর্ধশত াব্দী পার করে দিয়েও কোনও সার্থকতায় পৌঁছাতে পেরেছে? আত্ম -বিস্মৃত খুদি -বিস্মৃত মানুষের উত্থানের কবি হিসাবে তিনি যতই সার্থকতা লাভ করে থাকুন চিন্তানায়ক ইকবাল তাঁর স্বদেশীয়দের মহতী দুঃখের কারণ হয়েছেন কিনা সে প্রশ্ন

নিয়েখুব বেশি বিতর্কের অবকাশ কি আছে? আত্মশক্তির জাগরণের পরিণাম যদি শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ায় তাহলে সেই জাগরণ বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা ইকবাল, যাঁর দ্বারাই সম্ভব হয়ে থাকুক, তাঁর চিন্তার ধর্মীয় ভিত্তির পুনর্বিবেচনা না করে উপায় কী?

তথ্যসূত্র

১. Mohammad Hasan লিখিত 'A New Approach to Iqbal' -থেকে নেওয়া হয়েছে কিছু কিছু তথ্য।
২. কাজী আবদুল ওদুদের উদ্ধৃতিগুলি 'শাশ্বত বঙ্গ' নিবন্ধসংকলনের 'ইকবাল' নিবন্ধথেকে নেওয়া।
৩. 'চতুরঙ্গ' বর্ষ ৫৬ সংখ্যা ২ (ভাদ্র ১৪০৩)-য়ে প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধ 'আত্মশক্তির দুই কবি' থেকে নেওয়া হয়েছে শঙ্খ ঘোষের উদ্ধৃতিগুলি।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com